بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১১ মে ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১১ মে ২০১২-এর (১১ হিজরত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

বয়আতের দশম শর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজের সাথে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক এবং ভাতৃত্বের বন্ধনকে এতটা দৃঢ় করা আবশ্যক বলে উল্লেখ করেছেন যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া ভার। বয়আতের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে এমন সম্পর্ক আবশ্যক? কেননা বর্তমান যুগে তিনিই মহানবী (সা.)-এর সেই নিষ্ঠাবান প্রেমিক যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঈমানকে সূরাইয়া নক্ষত্র থেকে ভূপৃষ্ঠে নামিয়ে এনেছেন। ইসলামী শিক্ষায় যে সব বিদ'আত (বানানো) অনুপ্রবেশ করেছিল সেগুলোকে তিনি দূর করে প্রকৃত ইসলামের খাঁটি ও সমুজ্জ্বল শিক্ষাকে পুনরায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং খোদা তা'লার সাথে বান্দার (দাসদের) সম্পর্ক স্থাপন করিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে লিখেছেন,

'আমি আমার সত্য এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি, কোন মানুষ হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না আর না-ই পরমোৎকর্ষ ঐশীজ্ঞান থেকে অংশ পেতে পারে।'

অতএব মহানবী (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও তাঁর ভালবাসায় বিলীন হওয়াই মূলতঃ তার {মসীহ্ মওউদ (আ.)} আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ ও অন্যদের আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণ হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যমগুলোর অন্তর্ভূক্ত করে তাঁর প্রতি ভালবাসা ও ভাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনকে আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভালবাসার এমন দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন যা শেষ যুগের প্রেমিকদের সাথে প্রথম যুগের প্রেমিকদের মিলন ঘটিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার এই ব্যবহার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে লিখেছেন, **'মানুষ যখন সত্যি সত্যি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসে তখন আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসেন। তখন পৃথিবীর মানুষের মাঝে তার গ্রহণ যোগ্যতা**

বৃদ্ধি করেন। হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে তার জন্য প্রকৃত ভালবাসা সঞ্চার করেন এবং এক প্রকার আকর্ষণ ক্ষমতা তাকে প্রদান করা হয়। এক জ্যোতি তাকে প্রদান করা হয় যা সদা সর্বদা তার সাথে থাকে'।

কাজেই এই মর্যাদা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাভ করেছেন। এখন আমি তাঁদের কতক ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরব যাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সত্যিকার প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

হযরত আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমার সাক্ষাত বহুবার হয়েছে বরং সব সময় সাক্ষাত করতাম। আমার মনোবাঞ্ছানুসারে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাত-পা টিপে দিতাম। আমি হুযূর (আ.)-এর কথা-বার্তা ও ইলহাম শুনতাম। [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মজলিসে বসতেন, কথা-বার্তা বলতেন, ইলহাম শোনাতেন তখন আমি শুনতাম]। এই আগ্রহের বশবর্তী হয়েই আমি কাদিয়ানে স্থানান্তরিত হই। আমি এখানে এসে কাঠমিস্ত্রির কাজ শুরু করেছিলাম। আমার কাছে অনেক টাকা ছিল। কিন্তু যা নিয়ে এসেছিলাম তা সবই ফুরিয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, একদিন আমি হালুয়া বানিয়ে বিক্রি করা শুরু করলাম এবং হুযূরের বায়তুদ্ দোয়ার নিচে গিয়ে হাক ছাড়লাম, তাজা হালুয়া। হযরত উম্মুল মু'মিনীনের কানে আমার আওয়াজ পৌঁছল, তিনি আমাকে চিনতেন। তিনি (রা.) বললেন, ঠিকাদার কি কাজ শুরু করেছে? হুযূর (আ.) বললেন, পতঙ্গ প্রদীপে ঝাঁপ দিয়েই থাকে, এছাড়া আর করবে কী? এ কাজের জন্যই সে এখানে এসেছে। বাঁচার তাগিদে তাকে কিছু না কিছু তো করতেই হবে। এ কথা শুনে হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) বললেন, উনি একজন ঠিকাদার, উনার কাছে গাধা থাকার কথা, গাধা নিয়ে বের হলেই পারে। (সে যুগে ঠিকাদারদের কাছে গাধা থাকত যার মাধ্যমে তারা একস্থান থেকে অন্যত্র মালামাল বহন করত)। হুযূর বললেন, তার কাছে কোন গাধা নেই। আম্মাজান বললেন, কারো কাছে চাকরী করুক। হুযূর (আ.) বললেন, সে এতো শিক্ষিতও না। যাহোক কথাবার্তা চলছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, সে কাঠের কাজ জানে আর সে তা-ই করতে পারে। এতেই আল্লাহ্ বরকত দিন। তিনি বলেন, আমি নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের আলাপচারিতা শুনছিলাম। এরপর হুযূর আমাকে ডেকে বললেন, তোমার কাছে কোন কাঠ আছে কি? আমি বললাম, বরই ও অশ্বথ কাঠ আছে। অতিথিশালার চৌকির জন্য কয়েকটি পায়া দরকার, পায়া বানানো যাবে? তিনি বলেন, সেখানে তখন হুযূরের একজন সেবক ছিলেন তিনি বলেন, অশ্বথের পায়া বেশি দিন টিকে না। হুযূর (আ.) বললেন, যার জন্য বানানো তিনি নিজেই অশ্বথ গাছ জন্ম দেন, আর তিনি তা অযথা সৃষ্টি করেন নি। আমাকে বিশ জোড়া পায়া বানাতে বললেন। একথা ভাবেন নি যে, কোন কর্মচারী নিতে নিষেধ করেছে তাই নেব না। তিনি বলেন, বানিয়ে দাও। অর্থাৎ এখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছিল।

হযরত মালেক খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০২ সালে আমি মরহুম হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-এর সাথে কাদিয়ান দারুল আমান আসি। আমার মনে নেই যেদিন এসেছিলাম সেদিনই বয়আত করেছিলাম নাকি পরের দিন। তবে হ্যাঁ! একথা আমার খুব ভালভাবে মনে আছে, যোহরের নামাযের পর আমরা বয়আতের জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম। শহীদ মরহুম হযরত আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) সর্বপ্রথম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে হাতে রাখেন এবং দ্বিতীয় নম্বরে এ অধম হাত রাখে। বয়আতের পর সম্ভবতঃ দু'তিন দিন আমি কাদিয়ান দারুল আমানে অবস্থান করি। ইতিমধ্যে শহীদ মরহুম আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) আমাকে বললেন, আমি দিব্যদর্শনে দেখেছি, খোশতের শাসক আপনাকে কষ্ট দিবে কাজেই আপনি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে

যান। অতএব আমি দু'তিন দিন পর ফিরে গেলাম। আমার সাথে এক মোল্লা স্পেন গুল সাহেবও ফিরে গেলেন। শহীদ মরহুম সর্বদাই বলতেন, আমি আমার চেয়ে বড় কোন আলেম দেখি নি, এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ। {তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শহীদ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-এর ভালবাসার ঘটনা বর্ণনা করছেন) অর্থাৎ সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব বলতেন, বর্তমানে আমি আমার চেয়ে বড় কোন আলেম দেখি না, দেখলে আমি তার পদচুম্বন করতাম। কিন্তু এখানে (কাদিয়ান) এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর আমি নিজ চোখে শহীদ মরহুম আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র পদ-চুম্বন করতে দেখেছি। এভাবে তিনি যা বলেছিলেন তা করে দেখিয়েছেন।

হযরত সেকান্দর আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করার পূর্বেও আমি একবার কাদিয়ানে এসেছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রাতভ্রমণে বের হলে আমিও তাঁর সাথে গেলাম। স্থায়ীভাবে বসতি গাড়ার পূর্বেই তিনি একদিন এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, ভীনী ভাঙ্গর এর বিপরীত দিকে বাসরাওয়াঁ'র পথে যাচ্ছিলেন এমন সময় হুযূর (আ.) বলেন, **'যারা হুক্কা পান করা, আফিম, ভাঙ, চরস ইত্যাদির ন্যায় ছোট ছোট বদভ্যাস ছাড়তে পারে না যা ছেড়ে দিলে কেউ অসন্তুষ্টও হয় না তারা বড় বড় বিষয়কে কীভাবে পরিত্যাগ করবে যা পরিত্যাগ করার ফলে মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব অসন্তুষ্ট হতে পারে যেমন ধর্ম-পরিবর্তন'**। (অর্থাৎ আহমদীয়াত গ্রহণ করা কীভাবে সহ্য করবে, কেননা এরপর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়) যদি ঐসব সামান্য বদভ্যাস পরিত্যাগ করতে না পার, সহ্য করতে না পার তবে বড় কষ্ট কীভাবে সহ্য করবে? তিনি (রা.) বলেন, এ অধম তখন হুক্কা পান করতো। শোনামাত্র সেখানেই কসম খেলাম যে আর হুক্কা পান করব না আর এভাবে হুক্কার (বদভ্যাস) ছুটে গেল। পূর্বে আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ছাড়তে পারি নি। অতএব এটি সেই সম্পর্ক এবং ভালবাসা ছিল যা তাকে সেই মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগে বাধ্য করেছিল আর এভাবে বদভ্যাস থেকে তিনি মুক্তি পেলেন।

হযরত শুকর এলাহী সাহেব (রা.) আহমদী বর্ণনা করেন, আমি তখনো বালক ছিলাম বয়স তখন সম্ভবতঃ বারো বা তের হবে। ধর্ম সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম। সম্ভবতঃ গুরুদাসপুরে প্রাইমারীর কোন ক্লাসে পড়তাম। সে সময় আমাদের বিরুদ্ধবাদী মৌলভী আব্দুল করীমের মোকদ্দমা চলছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় অনুসারীদের নিয়ে তহসিল অফিস সংলগ্ন পুকুরের পার্শ্বে হাইস্কুলের উত্তর দিকে বের হতেন। এই অধম মাদ্রাসা ছেড়ে তাঁর অবস্থানস্থলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত এবং তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে চেয়ে থাকত। তাঁর একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান অনুসারী তার নাম আমি বালক ছিলাম (বয়স কম হবার কারণে) তাই আমি তার নাম জানি না তবে উক্ত ব্যক্তি ডান হাতে বড় পাখা ধরে সজোরে বাতাস করতেন। আমি তাকে দেখতে থাকতাম আর তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে পাখা চালিয়ে যেতেন। আমি এই ভেবে অবাক হতাম, তিনি ক্লান্ত হন না অথচ পাখা হাতেই ধরা আছে? এমন নয় যে আস্তে বাতাস করতেন বরং খুব জোরে, যেভাবে বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরে। গরমকাল ছিল। দ্বিতীয়-তৃতীয়বার ঘুরে ঘুরে আসতাম এবং সেই সাহেবকেই দেখতাম আর ভাবতাম, এটি কেমন জাদু, বড় পাখা অথচ সমস্ত দিন এক হাত দিয়েই বাতাস করে চলেছেন, কিন্তু এখন আমি বুঝি যে তিনি সত্যিকারের প্রেমিক ছিলেন।

হযরত মদদ খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার পবিত্র রোযার মাসে নিজ অঞ্চলে অবস্থান কালে আমার কাদিয়ান গিয়ে রোযা রাখার এবং সেখানেই ঈদের নামায পড়ে তারপর চাকরিতে যোগদান করার সাধ জাগে। সে দিনগুলোতে নতুন নতুন সেনাবাহিনীতে জমাদার হিসেবে ভর্তী হয়েছিলাম। (এটি সেনাবাহিনীর জুনিয়র কমিশন

অফিসারের একটি র‍্যাঙ্ক ছিল)। সে সময় সর্বদা আমার মনে এ আকাঙ্খা জাগত, আমি আমার চাকরিতে যোগদানের পূর্বে কাদিয়ান যাব যেন হুযূরের পবিত্র চেহারা দর্শন করে আসতে পারি এবং দ্বিতীয়বার তাঁর পবিত্র হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করি। এর কারণ হল আমি ডাকযোগে ১৮৯৫ বা ১৮৯৬ সালে প্রথম বয়আত করেছিলাম। মোটকথা তখন কাদিয়ান আসার আমার প্রথম সুযোগ ছিল এ জন্যই আমার হৃদয়ে সর্বাগ্রে এ চিন্তাই আসল হোক বা না হোক এ সুযোগে অবশ্যই হুযূরের দর্শন লাভ করতে হবে। একবার চাকরিতে যোগদান করে ফেললে হয়ত হুযূরকে দেখার সৌভাগ্য আর হবে না। তাই ইচ্ছা হল, প্রথমে কাদিয়ান চলে যাব এবং হুযূরকে দেখে আসব এরপর সেখান থেকে ফেরত এসে চাকরিতে যোগদান করব। আমি কাদিয়ান সম্পর্কে জেনেই এখানে এসেছি কিন্তু কাদিয়ান এসে হুযূরের পবিত্র চেহারা দর্শন লাভ করতেই আমার হৃদয়ে এ ভাবনার উদ্রেগ হল, আমি যদি কাশ্মীরের পুরো রাজত্বও পেয়ে যাই তবুও হুযূরকে ছেড়ে কাদিয়ানের বাইরে কখনোই যাব না। এটি কেবলমাত্র হুযূরের আকর্ষণ শক্তিই ছিল যা আমাকে ফেরত না যেতে বাধ্য করছিল। আমার জন্য হুযূরের পবিত্র চেহারা দেখে কাদিয়ান থেকে বাইরে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে গেল। এমন কি আমি হুযূরকে দেখে সবকিছু ভুলে গেলাম। আমার হৃদয়ে কেবল একটাই চিন্তা আসল, বাইরে তোমার বেতন যদি হাজার টাকাও হয় তাতে কি যায় আসে। কিন্তু বাইরে চলে গেলে তুমি আর কখনো এই জ্যোতির্ময় ও পবিত্র চেহারা দেখতে পাবে না। এই ভেবে স্বদেশে যাবার চিন্তা পরিত্যাগ করলাম। আমি মনে মনে নিজেকে বললাম, যদি আজ বা কাল তোমার মৃত্যু হয় তাহলে নিশ্চয় হুযূরই তোমার জানাযা পড়াবেন আর এতে তোমার তরী পার হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌ও সন্তুষ্ট হবেন- তাই স্থায়ীভাবে কাদিয়ানে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে আমার নিত্যদিনের কাজ ছিল, প্রতিদিন হুযূরের খিদমতে দোয়ার জন্য একটি খাম তাঁর দরজায় গিয়ে কারো হাতে পাঠিয়ে দিতাম কিন্তু মনে এই সংশয় বিরাজ করত হুযূর আমার এই কর্মে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন না তো? পাছে তিনি আবার মনে না করেন, এই ব্যক্তি সব সময়ই বিরক্ত করে। কিন্তু আমার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। এর কারণ হল, একদিন হুযূর আমাকে লিখিত উত্তর পাঠালেন, আপনি আমাকে স্মরণ করানোর ভাল পন্থা অবলম্বন করেছেন। আমিও আপনার জন্য খোদা তা'লার কাছে দোয়া করি। ইনশাআল্লাহ্‌ ভবিষ্যতেও করতে থাকব।

মৌলভী জামাল উদ্দীন সাহেবের পুত্র হযরত মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, তখন আমার বয়স ছিল প্রায় বিশ বছর, গুরুদাসপুরে করম দ্বীন জেহলুমী'র মামলার রায় ঘোষণার কথা ছিল। আমি পূর্বেই নিজ গ্রাম থেকে সেখানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে একটি বাংলোতে হুযূর (আ.)-ও অবস্থান করছিলেন। গরমকাল ছিল। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) এদিকের একটি কক্ষে বসে ছিলেন এবং সেখানে আমার পিতা মিয়াঁ জামাল উদ্দীন সাহেব, মিয়াঁ ইমাম উদ্দীন সাহেব শেখোয়ানী এবং চৌধুরী আব্দুল আযীয সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। আমি গিয়ে হুযূরকে পাখা দিয়ে বাতাস করা শুরু করলাম। হুযূর একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং আমার পিতা মিয়াঁ জামাল উদ্দীনের প্রতি ইঙ্গিত করে মুচকি হেসে বললেন, মিয়াঁ ইসমাঈলও এসে সওয়াবে ভাগ বসালো। তুচ্ছ ও সেবায় হুযূরের এমন আনন্দিত হওয়া আমার আজও মনে পড়ে আর হৃদয়ে এক আনন্দ অনুভূত হয়।

হযরত শেখ আসগর আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, বাহির থেকে আগত বন্ধুরা ফেরত যাবার সময় যখন হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর কাছে অনুমতি চাইতেন তখন তিনি (আ.) তাদেরকে ঘন ঘন কাদিয়ান আসার জোর তাগিদ দিতেন। এমনকি কোন কোন সময় এ-ও বলতেন, এখন আরো কিছুদিন অবস্থান কর। এমন সাহাবীদেরকে বলতেন যাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হত, এদের আরো কিছুদিন অবস্থান করার সুযোগ আছে।

প্রত্যেককে বলতেন না, যাদের সম্বন্ধে মনে করতেন, এরা অবস্থান করতে পারে তাদেরকেই বলতেন, তোমরা আরো কিছুদিন অবস্থান কর। যেন বন্ধুদের বিচ্ছেদে হুযূর (আ.)-এর বেশ কষ্ট হতো। প্রত্যেক বন্ধুকে বিদায়ের পূর্বে মোসাফা বা করদর্মন করার তাগিদ দেয়া ছিল এবং প্রত্যেকে করমর্দন করে অনুমতি নিয়ে ফিরে যেতেন তা যত বিলম্বই হোক না কেন। আমার যতটুকু মনে আছে, মোসাফা না করে অনুমতি না নিয়ে কারোই কখনো যাওয়া হতো না। বেশ কিছু বন্ধুর ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে, মোসাফা করার পালা অনেক বিলম্বে এসেছে আর তারা যখন রওয়ানা হয়েছেন তখন স্টেশনে গাড়ীর নির্ধারিত সময় পৌঁছার কোন আশা ছিল না। কিন্তু ঐশী হস্তক্ষেপে হুযূরের দোয়ার কল্যাণে এমনটি বেশ কয়েকবার ঘটছে, গাড়ী বিলম্বে বাটালা এসেছে আর তারা অনায়াসে গাড়ীতে উঠেছেন। এরপর তিনি নিজের ঘটনা লিখছেন, একবার স্বয়ং আমার সাথেও একই ঘটনা ঘটেছে, আমরা দেরীতে রওয়ানা হয়েছি এবং সেদিন কোন এক্কা গাড়ীও (অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ীও) পাইনি। আমরা কয়েকজন বন্ধু একত্রে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম। সে দিনগুলোতে সম্ভবতঃ সন্ধ্যে প্রায় সাড়ে ছ'টায় রেলগাড়ী বাটালায় পৌঁছতো সেই গাড়ীতেই উঠবো বলে মনস্থির করেছিলাম কিন্তু সময় অতি সামান্য বাকী ছিল মনে হচ্ছিল। দোয়াও করতে থাকলাম এবং খুবই দ্রুতগতিতে হাঁটতে লাগলাম এমনকি দৌঁড়েও কিছুটা পথ অতিক্রম করেছি। আল্লাহ্ তা'লা মনোবল দিলেন। আমরা যখন তহসিল অফিসের নিকট পৌঁছলাম তখন খবর নিয়ে জানতে পারলাম, ট্রেন এখনো আসেনি। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মনের সুখে ট্রেনে চড়লাম, এসব কিছু হুযূর (আ.)-এর আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কারণে হয়েছিলো।

হেকীম মুহাম্মদ হুসেন মরহুমে ঈসা'র পুত্র হযরত মাস্টার নযীর হুসেন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার অভ্যাস ছিল, আমি যখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে বসার সুযোগ পেতাম অথবা হুযূর (আ.)-এর বক্তৃতা শোনার সুযোগ হতো, সাথে কাগজ কলম রাখতাম আর যখনই কোন কথা আমার জন্য আবশ্যকীয় ও জীবনের জন্য কল্যাণকর ও আবশ্যকীয় মনে হতো আমি তাৎক্ষণিক ভাবে তা লিখে ফেলতাম।

মিয়াঁ আব্দুস সাত্তার সাহেবের পুত্র হেড মাস্টার হযরত আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০১ বা ১৯০২ সালে এক নবাব সাহেব সেবকদের সাথে নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নিকট চিকিৎসার জন্য কাদিয়ান আসেন। একদিন আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের নিকট বসা ছিলাম, সে সময় নবাব সাহেবের দু'জন কর্মচারী আসলো যাদের একজন শিখ আর অপর জন ছিল মুসলমান। তারা বলল, নবাব সাহেবের অঞ্চলে ভাইসরয় সাহেব আসছেন। আপনি এমন লোকদের সাথে সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন। নবাব সাহেবের ইচ্ছা হল, হুযূর কয়েকদিনের জন্য নবাব সাহেবের সাথে সেখানে চলুন। তিনি (রা.) বললেন, আমি আমার আমার জীবনের মালিক আমি নই। আমার এক মনিব আছেন, তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নাও। যোহরের নামাযের সময় সেই দুই কর্মচারী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল। হুযূর (আ.) বললেন, **'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি যদি মৌলভী সাহেবকে আগুনে নিক্ষেপ করি তবুও তিনি না করবেন না, পানিতে ডুবিয়ে দিলে না করবেন না তবে তাঁর এখানে অবস্থান করাতে হাজারো মানুষ উপকৃত হচ্ছে। একজন দুনিয়াদারের জন্য এ কল্যাণ ধারাকে বন্ধ করতে পারবো না। নবাব সাহেবের যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে তবে তিনি এখানে থেকে চিকিৎসা করাতে পারেন। এটি নয় যে, ভাইসরয়ে আসছেন তাই তার কাছে চলে যাবেন। এখানে যেহেতু গরীবরা লাভবান হচ্ছে তাই তারাই প্রাধান্য পাবে'**। এরপর বর্ণনাকারী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, তিনি (রা.) তাঁর প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আস্থার কথা

শুনে খলীফা আউয়াল (রা.) যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাহল, 'যদি আগুন বা পানিতে নিক্ষেপ করি তবে তিনি তাতে ঝাপ দেবেন' এটি ছিল আস্থার বহিঃপ্রকাশ। বর্ণনাকারী বলেন, সে দিনই আসরের নামাযের পর কুরআনের দরসের সময় হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, আজ আমি এত আনন্দিত যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমার এক মনিব আছেন আমি সর্বদাই চেষ্টিত থাকি তিনি যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। আজ আমার জন্য এক আনন্দের দিন। তিনি (আ.) আমার প্রতি এ আস্থা রাখেন যে, যদি নূরউদ্দীনকে আগুনে নিক্ষেপ করি তবুও সে না করবে না, পানিতে ডুবিয়ে দিলেও সে প্রতিবাদ করবে না।

হযরত মাস্টার ওধাবে খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, অবসর প্রাপ্ত মাস্টার আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব যিনি বর্তমানে কায়িানের দারুর্ রহমত মহল্লায় থাকেন, তিনি যখন গুজরাঁওয়ালার কিলা' দীদার সিংহ স্কুলের সহকারী শিক্ষক ছিলেন সে সময় তিনি আমাকে বলেন, আমি একবার কাদিয়ান যাই। তখন হুযূর (আ.) মসজিদে মুবারকে লোকদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেবও সেখানে বসা ছিলেন। হুযূর (আ.) তার প্রতি ইশারা করে বলেন, উনি আমার প্রকৃত প্রেমিক। এরপর যখন তিনি (রা.) মসজিদে থেকে বাইরে আসলেন তখন চত্তরে দাঁড়িয়ে ওয়াজের স্বরে বলেন, যে ব্যক্তিকে তার প্রেমাস্পদ একথা বলেন, **'এ আমার প্রিয়, তার আর কি চাই'?**

ওমর বখ্শ সাহেবের পুত্র হযরত মাষ্টার মওলা বখ্শ সাহেব (রা.) বলেন, আমি একবার কাদিয়ান এসেছিলাম। ছুটি শেষ হতে দু'তিন দিন বাকী ছিল। আমি হুযূরের অনুমতি নিয়ে যাত্রা করে যখন খাকরূবুঁ মহল্লার বাইরে বাটালার রাস্তায় চলে গেলাম, তখন আর সামনে অগ্রসর হতে ইচ্ছা হল না। সেখানেই ক্ষেতের উপর বসে পড়লাম এবং চিৎকার করে অঝোরে কাঁদলাম এবং কাদিয়ান ফিরে আসলাম। যেতে মন চাচ্ছিল না। মনের মধ্যে এক প্রকার অস্থিরতা বিরাজ করছিল। মৌসুমী ছুটি শেষ করে তারপর ফেরত গেলাম। এটি ছিল হুযূরের ভালবাসার প্রভাব।

হযরত মৌলভী মুহিব্বুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার সাথে ১৮৯৯ সালে কাদিয়ান যাই। বাটালা থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে আমরা কাদিয়ান পৌঁছি, যখন ঘোড়ার গাড়ী মেহমান খানার দরজায় পৌঁছে, আমার পিতা ঘোড়ার গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌঁড়ে চলে গেলেন। গাড়ী চালক আমাদের মালপত্র বের করল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আমার পিতা অভ্যাস বহির্ভূতভাবে লাফিয়ে ছুটলেন কেন? কিছুক্ষণের মধ্যে হাফিয হামেদ আলী সাহেব (রা.) বাইরে আসলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ জিনিষপত্র কি হাবীবুর রহমান সাহেবের? আমার হ্যাঁ সূচক জবাব শুনে তিনি মালামাল অতিথিশালায় নিয়ে গেলেন এবং আমিও সাথে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমার পিতা ফেরত আসলেন। পরদিন ভোরে ফজর নামাযের পর আমার পিতা আমাকে সাথে নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ঘরে গেলেন। ঘরের দরজায় পৌঁছানোর পর হযরত সাহেব নিজেই দরজা খুললেন। আমরা যে ঘরে প্রবেশ করলাম সেটি ছিল বাইতুল্ ফিক্রের পাশের কক্ষ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তক্তপোশে বসলেন। পাশে একটি আলমারী ছিল যাতে অনেক বই রাখা ছিল। আমরা দু'জন নিকটে রাখা একটি চৌকিতে বসলাম। আমার পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেন। এরপর তিনি নিবেদন করেন, হুযূর আমি মুহিব্বুর রহমানকে বয়আত করানোর জন্য নিয়ে এসেছি। হুযূর (আ.) বললেন, সে তো বয়আতকারীদের অন্তর্ভূক্ত। (অর্থাৎ তার শৈশবে পিতা বয়আত করেছেন বা সে জন্মগত আহমদী, বা পিতা বয়আত করেছেন সেই সুবাদে বাচ্চারাও জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে)। আমার পিতা তখন

বললেন, সে বয়আত করুক আমি এটিই চাই যেন দোয়ার অংশ পেতে পারে। হুযূর (আ.) বললেন, ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যায় বয়আত নিয়ে নিব। সেদিন সন্ধ্যায় মাগরীবের নামাযের পর অন্যান্য বন্ধুর সাথে খাকসার বয়আত করে। তখন আমি বুঝতে পারলাম, কাদিয়ান পৌঁছার দিন আমার পিতা ঘোড়ার গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যে গিয়েছিলেন তার কারণ এটিই ছিল অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার গভীর প্রেম ও ভালবাসা ছিল যা তাকে অস্থির করে রেখেছিল; এ কারণে গাড়ী থেকে নেমেই তিনি সোজা হুযূর (আ.)-এর কাছে চলে যান। আমার পিতার রীতি ছিল, কাদিয়ান পৌঁছেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে চলে যেতেন এবং প্রতিদিন ভোরে পৃথকভাবে হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতেন।

হযরত হাজী মোহাম্মদ মূসা সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমার ছেলে আব্দুল মুজীব যার বয়স তখন প্রায় চার বছর ছিল, গোঁ ধরল যে সে হযরত সাহেবকে জড়িয়ে ধরবে। সে মাগরীবের সময় থেকে সকাল পর্যন্ত এ নিয়ে জিদ করল। আর আমাদেরকে রাতে খুবই বিরক্ত করল। সকালে উঠে প্রথম গাড়িতেই তাকে নিয়ে বাটালা পৌঁছি। আর সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কাদিয়ানে যাই। যাবার পরই হুযূর (আ.)-এর খিদমতে এ সংবাদ পাঠাই- আব্দুল মজীদ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায়। কোলাকুলি করতে চায়। (চার বছর বয়স্ক ছোট বালক ছিল)। তখন হুযূর বাইরে আসলেন আর আব্দুল মজীদ হুযূরের পা জড়িয়ে ধরল আর এভাবে সে হুযূরের সাথে সাক্ষাত করল। তখন এই চার বছরের বালক বলতে লাগল, এখন মন প্রশান্ত হয়েছে।

হযরত মিয়াঁ আব্দুল গাফ্ফার সাহেব জারাহ্ বর্ণনা করেন, একবারের ঘটনা, হুযূর সিঁড়ি থেকে নেমে এসে আহমদীয়া চত্তরে দাঁড়ালেন। আমার স্মরণ আছে, হুযূর নিজের লাঠিকে কমরেরর সাথে লাগিয়ে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি ঐ সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর চিকিৎসালয়ে দাঁড়ানো ছিলাম। আমি হুযূরকে দেখে আমার পিতাকে বললাম বাবা! হুযূর এসে গেছেন। আমার পিতা বললেন, জোরে বলো না। লোকেরা শব্দ শুনে ছুটে আসবে, ভীড় লেগে যাবে আর আমরা হুযূরের কথা শোনার স্বাদ পাবো না। {এটিও প্রেম ও ভালবাসার বিষয়- তারা চাইতেন, আমাদের আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে যেন অন্য কোন লোক বাঁধ সাধতে না পারে। অথবা বেশি লোক যেন না আসে। অথবা এতো লোক পূর্ব থেকেই যেন একত্রিত না হয়ে যায় যার ফলে আমাদের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব হয়ে যাবে।} তিনি বলেন, তারা উঠে হুযূরের সাথে মোসাফা কা করমর্দন করলেন। হুযূর আমার পিতাকে বললেন, মিয়াঁ গোলাম রসূল! অমৃতসরের কোন কথা বলুন? পিতা বললেন, হুযূর! মানুষ মাঝে অন্য কথা বলা শুরু করে দেয়। আমি গরীব মানুষ— যখন আমি বলা শুরু করব তখন আরও লোক এসে যাবে এবং তারা কথা বলা আরম্ভ করবে আর আমার কথা থেকে যাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, আজ কেবল তোমার সাথেই কথা হবে আর কারো নয়। হুযূর সে দিন দারুল আনোয়ার মহল্লার দিকে ভ্রমণে গেলেন যেখানে বর্তমানে হুযূর (আ.)-এর বাংলো রয়েছে। যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন খাঁজা কামাল উদ্দীন সাহেবের শ্বশুর খলীফা রজব উদ্দীন সাহেব কাশ্মীরি ভাষায় বললেন, এখন থামো, আমাদেরকেও কথা বলতে হবে। হুযূর (আ.) বললেন, আজ মিয়াঁ গোলাম রসূলের সাথেই কথা হবে অন্য কারো নয়। তাকেও চুপ করিয়ে দিলেন আর মোল্লাদের বিষয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। আমার স্মরণ আছে- পিতা শুনিয়েছেন; ‘আমি হুযূরের সাথে অমৃতসরের এক মোল্লার বিষয়ে কথা বলছিলাম। সে আমাকে বলল, তুমি মির্যা সাহেবকে ছেড়ে দাও। আমরা তোমাকে অনেক টাকাপয়সা সংগ্রহ করে দিব। কিন্তু আমি বললাম, (তার প্রদত্ত উত্তরটি নিয়ে চিন্তা করুন) অমুক সওদাগর এক মহিলা রেখেছে, সে এই মহিলাকে ত্যাগ

করতে পারছে না। তাহলে আমি কীভাবে খোদার নবীকে ত্যাগ করতে পারি? অর্থাৎ জগত পূজারী জগতের মোহে ইহজগতকেও নষ্ট করছে আর পরকালকেও নষ্ট করছে, দুর্নামও হচ্ছে। আর আমি খোদার ভালবাসার খাতিরে খোদার নবীর সাথে প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ তাই আমি কীভাবে তাঁকে ছাড়তে পারি? এর মাধ্যমেই আমার ইহকাল ও পরকাল সুনিশ্চিত হবে।

হযরত শেখ জয়নুল আবেদীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার এক ভাই মেহের আলী সাহেব অষ্টম শ্রেণীতে পড়তেন। তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। ছয় মাস যাবত ডায়রিয়ায় ভুগছিলেন। আমরা চিকিৎসা করেছিলাম। যখন আরোগ্য লাভ হচ্ছিল না তখন আমরা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গেলাম এবং তাকে কাদিয়ানে নিয়ে আসলাম। হুযূরের প্রতি ইলহাম হয়েছিল, আমি এখানে এক প্রিয় বাচ্চার জানাযা পড়াবো। আর হুযূর এই ইলহামটি তাঁর নিজেরই কোন সন্তান সম্পর্কে মনে করতেন। কিন্তু যখন মেহের আলীকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো তখন প্রায় মাস দেড়েক মাস তার চিকিৎসা করা হয়। কিছুটা ভাল হয়েছিল কিন্তু হুযূরের প্রতি ইলহাম হলো, এ বাচ্চা বাঁচবে না। এতে তিনি হাফিয হামেদ আলী সাহেব (রা.)-কে বললেন, এই ছেলেকে অর্থাৎ তোমার ভাইকে বাড়ীতে নিয়ে যাও। এই ছেলে বাঁচবে না। আর যদি সে এখানে মারা যায় তাহলে তোমার আত্মীয়-স্বজনের এখানে আসতে কষ্ট হবে। আমি ডুলি বানালাম। **(পালকির মত বাহন)** তাকে ডুলিতে বসিয়ে বাজার পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। কিন্তু সে বলল, আমি কিছুতেই ফেরত যাব না। বার-তের বছরের বালক ছিল। সে বলল, যদি মরতে হয় তাহলে এখানেই মরবো। আমি মির্যা সাহেবের কাছেই থাকব। আমাকে যে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, যদি তোমরা আমাকে ফেরত না নাও তাহলে আমি এই ডুলি থেকে লাফ দিব। কাজেই আমি তাকে ফেরত নিয়ে আসলাম এবং হযরত সাহেবের নিকট খবর পাঠালাম। তিনি বললেন, ঠিক আছে তাকে থাকতে দাও। সে এখানেই মারা যাবে। কিন্তু স্মরণ রেখ! সে হাটাচলা অবস্থায় মারা যাবে। এটা মনে করবে না যে, সে অসুস্থ হবে বা শুয়ে থাকবে। সে হঠাৎ মারা যাবে, সয্যাশায়ী অবস্থায় মারা যাবে না। যে দিন তার মারা যাবার কথা সে দিন সে বাজারে গেল, দুধ পান করল এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে বাড়ীতে ফিরে আসল। সে মাকে বলতে লাগলো, মা এখন প্রদীপ নিভে যাবে। মা মনে করল, ছেলে বলছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রদীপ জ্বালাও। কিন্তু সে বলল আমার কথার উদ্দেশ্য এটি নয় বরং আমার উদ্দেশ্য হলো এই। মা বুঝে গেলেন। মা দন্ডায়মান অবস্থায় ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর সে অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। হযরত সাহেব জানাযা পড়ালেন এবং এখানেই দাফন-কাফন সম্পন্ন হলো। তিনি বলেন, হযরত সাহেব এত দীর্ঘ জানাযা পড়ালেন, আমরা ক্লান্ত হয়ে গেলাম। লোকজন কাঁদছিল।

হযরত মিয়াঁ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বড় সাধ নিয়ে মোকাদ্দমার রায় শোনার জন্য হুযূরের শুভাগমনের একদিন পূর্বেই জেহলম পৌঁছে গেলাম। জেহলমের বিখ্যাত মামলার কথা এটি। গাড়ী আসার দু'ঘন্টা পূর্বেই ষ্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি ষ্টেশনের দৃশ্য দেখেছি, দশ ফুট অন্তর অন্তর পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। লোকজন প্রাচীরের উপর চড়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু পুলিশ ভেতরে যেতে দিচ্ছিল না। গাড়ী আসার সময় এতভীড় হয় যে, অবশেষে তা পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। লোকজন সবাই প্রাচীর টপকে ভেতরে চলে গেল। যখন হযরত সাহেব গাড়ী থেকে নামছিলেন তখন আহমদী বন্ধুরা মানব বন্ধন গড়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে বাহির পর্যন্ত একটি পথ বানালো। চৌধুরী মওলা বখ্শ সাহেব যিনি শিয়ালকোটের বিখ্যাত আহমদী ছিলেন তিনি সর্ব প্রথম এই পথ দিয়ে হযরত সাহেবের গাড়ী পর্যন্ত গেলেন, তারপর হযরত সাহেব গেলেন সাথেই কাবুলের শহীদ মৌলভী আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) গেলেন আর মৌলভী আহসান সাহেবও গাড়ীতে বসলেন। ভীড়ের কারণে

গাড়ী চলতে খুব সমস্যা হচ্ছিল। গোলাম হায়দার তহসিলদার সাহেব পরম আন্তরিকতার সাথে সব কিছুর ব্যবস্থা করতে লাগলেন। প্রথমে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি পুলিশকে জোর দিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি মানুষকে বিরত রাখার জন্য নিজেই চেষ্টা আরম্ভ করলেন। এমন কি তিনি চাবুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আমাদের হৃদয় ছিল তখন দুঃখ-ভারাক্রান্ত, তিনি মঙ্গলমতো বাংলোতে পৌঁছুক খোদার কাছে এ দোয়াই করছিলাম। তখন জেহলম নিবাসী এক মৌলভী বুরহান উদ্দীন সাহেব একটি বেগ বগলে চেপে গাড়ীর সম্মুখ দিয়ে হাঁটছিলেন; আমার মনে আছে, কোন কোন সময় আবেগের আতিশয্যে তিনি একথা বলে উঠতেন, **"গরীবের বাড়ীতে হাতির পাঁ"** । অবশেষে হযরত সাহেব কুঠিতে পৌঁছে গেলেন।

হযরত মিয়াঁ উযীর মুহাম্মদ খাঁন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যেদিন এসেছি সেদিন আরেক ব্যক্তিও আমার সাথে এখানে আসে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে আর আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু সুস্থ হয়ে গেলাম। প্রথমে আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, কয়েক গ্রাস খাবার খেতাম আর তাও হজম হতো না। কিন্তু এখানে এসে এক রাতেই দু'টি রুটি খেয়ে নিতাম। অমৃতসর ফেরত যাবার পর পুনরায় আমার একই অবস্থা হয়ে গেল। প্রথমবার যখন হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলো তখন মসজিদে মুবারকের পাশে ছোট্ট একটি কামরায় আমি ওযূ করছিলাম; হযরত আকদাস ভেতরে আসলেন। হুযূরের চেহারা দেখতেই আমি অভিভূত হয়ে গেলাম এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্য বান্দার বৈশিষ্ট্যাবলী দেখে নেশাগ্রস্তের মত হয়ে গেলাম। জুমুআর দিন আমি হযরত সাহেবের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মসজিদ আকসায় নামায পড়ি। সে সময় হযরত সাহেবের দৃষ্টি পড়েছিল অর্থাৎ আমার প্রতি তাকালেন এ দৃষ্টির এমন প্রভাব পড়ে যে, আমি নামাযের পূর্বেও পরে যারপরনাই ক্রন্দন করি। সূফীদের পরিভাষায় এটিকে বলা হয় গোসল করা। আসরের সময় যখন পুনরায় হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত হয় তখন হুযূর জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন? আমি নিবেদন করি এখন ভাল হয়ে গিয়েছি। আমরা যখন প্রথমবার কাদিয়ান যাই তখন কোন অতিথিশালা ছিল না। হযরত সাহেবের ঘর থেকে আচার এবং রুটি পাঠনো হয়েছিল, তাই খেয়েছি। যে কক্ষে বর্তমানে মোটর রয়েছে সে সময় সেখানে ছাপাখানা ছিল। অতিথিরাও সেখানেই অবস্থান করতের আর আমিও সেখানে উঠে ছিলাম।

হযরত ডাঃ গোলাম গওস সাহেব বর্ণনা করেন, মীর মেহেদী হাসান সাহেব (রা.) বলেন, একদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে বরফ আনার জন্য অমৃতসর পাঠান। রাস্তায় রেল গাড়ীতে বসা অবস্থায় যে-ই আমি মাথা বের করি আমার মাথার রেশমি টুপি বাতাসে উড়ে যায়। অমৃতসর থেকে বরফ নিয়ে যখন ফেরত আসি তখন মীর নাসের নওয়াব সাহেব বলেন, তোমাকে কি কেউ মেরেছে? আমি বলি না, তিনি বলেন, তাহলে তোমার মাথা খালি কেন? আমি বলি, আমার টুপি রাস্তায় বাতাসে উড়ে গেছে। তিনি হযরত সাহেবের নিকট গিয়ে সেটি বলে দেন। হযরত সাহেব বলেন আমরা টুপি দিয়ে দেবো, এরপর আমি আর চাইনি বরং দু'আনার একটি টুপি কিনে নেই। (অর্থাৎ) সে যুগে দু'আনায় একটি টুপি পাওয়া যেতো তা ক্রয় করে মাথায় পরে নেই। প্রায় ছয় মাস পরে হযরত সাহেব আমাকে একটি টুপি, একটি আলপাকার কোট এবং এক জোড়া জুতা উপহার দেন। (আলপাকা দক্ষিণ আমেরিকার একটি জন্তু যার পশম দিয়ে অত্যন্ত অভিজাত কাপড় তৈরী হয়) কোর্টটি আমি পরিধান করি আর তা অল্পদিনেই ছিড়ে যায়, টুপিটি আমি মাথায় পরিধান করি। আর জুতো জোড়া আমি আমার পিতাকে পরিয়ে দেই। ঘরে যাবার সময় রাস্তায় এক ডেপুটি রেঞ্জার আমাকে বলেন, মীর সাহেব আপনার মাথার টুপি ময়লা হয়ে গেছে, আমি অমৃতসর থেকে আপনাকে নতুন টুপি এনে দিচ্ছি। আমি বললাম, এমন মানের টুপি কোথাও পাওয়া

যাবে না, না পৃথিবীতে না আকাশে। তিনি বলেন, বুঝিয়ে বলুন? আমি বললাম, এটি পবিত্র মসীহ্‌র মাথায় দু'বছর শোভা পেয়েছে। তিনি বলেন, বেশ ভাল। সেই ব্যক্তি পবিত্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনিও পরবর্তিতে হুযূরের শিষ্যত্ব বরণ করেন।

হযরত মৌলভী আযীয দ্বীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, পঞ্চাশ ষাট বা সত্তর বার আমি হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি। যতবারই এসেছি প্রতি বারই আশার সাথে সাথে হযরত সাহেবের নিকট নিজের পাগড়ি খুলে রেখে দিয়ে হযরত সাহেবের হাত দু'টিকে নিজের মাথায় বুলাতাম। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি হাত ছেড়ে না দিতাম হযরত সাহেব কখনো হাত টেনে নেয়ার চেষ্টা করতেন না। এর ফলশ্রুতিতে আমার একাশি বছরের জীবনে কখনো অসুস্থ হইনি; তবে কাদিয়ানে দু'একটি সামান্য আঘাত পেয়েছি।

শেখ মাসীতা সাহেবের পুত্র হযরত শেখ মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.) বলেন, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) নামায সেরে যখন বসতেন তখন আমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকত না। কেননা আমরা এটি জানতাম, এখন আল্লাহ্ তা'লার সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনা শুনে আমরা ঐশী প্রেমের সূরা পান করব আর আমাদের হৃদয়ের মরিচাগুলো দূরীভূত হবে। ছোট বড় সবাই পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নিজেদের প্রেমাস্পদের প্রিয় এবং পবিত্র মুখের দিকে গভীর আগ্রহের সাথে তাকিয়ে থাকতো যেন তিনি (আ.) নিজ কল্যাণমন্ডিত মুখে যা বর্ণনা করবেন তা ভালভাবে শ্রবণ করতে পারে। এই ছিল তাঁর প্রেমিকদের অবস্থা। তাঁর (আ.) কথা শ্রবণ করতে গিয়ে আমরা কখনো ক্লান্ত হইনি আর হযরত আকদাস (আ.)-ও নিজের প্রিয়দের কথা শুনে কখনো বিরক্তও হতেন না এবং কথার মাঝে বাধাও দিতেন না। আমি কখনো তাঁকে (আ.) কানাকানি করতে দেখি নি।

করাচী জামাতের প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দীন সাহেব, সৈয়দ ফকীর মুহাম্মদ সাহেব আফগানীর কন্যা হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব শহীদের শিষ্যদের অন্তর্ভূক্ত হযরত সিরাজ বিবি সাহেবার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এ ঘটনায় শিশুদের মাঝেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি কেমন অদ্ভুত ভালবাসা ছিল তার উল্লেখ রয়েছে।

একবারকার ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমগাছের নীচে উত্তর দক্ষিণে বানানো একটি পরিত্যক্ত কুপের সন্নিকটবর্তী রাস্তায় একাকী বাগানে পায়চারী করছিলেন যা মির্যা সুলতান আহমদের বাগানের দিকে একটি দরজার মাধ্যমে খুলে। বাগানে বাতাস খাওয়ার জন্য তিনি হাঁটছিলেন। আমিও হুযূরের পিছনে পিছনে হাঁটছিলাম এবং যে যে স্থানে হুযূরের পা পড়ছিল আমিও ভালবাসার কারণে তা অনুসরণ করছিলাম। আমার জানা ছিল এরূপ করার ফলে কল্যাণ লাভ হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার পায়ের শব্দ শুনে আমার দিকে তাকান এবং পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করেন।

হযরত মিয়া যহুর উদ্দিন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, কাদিয়ান জলসা থেকে বন্ধুদের ফেরত যাবার পর দ্বিতীয় দিন আমরাও নিজেদের বাড়ীতে ফেরত চলে আসি। প্রায় তিন চার মাস পর হঠাৎ করে সংবাদ পাই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোরে ইন্তেকাল করেছেন। আমার শ্বশুর কাজী জয়নুল আবেদীন সাহেব সেই সংবাদ শুনে পাগলের ন্যায় হয়ে যান। আমাদের মাথায় কিছুই আসছিল না। এই অবস্থায় আমরা সারহিন্দ ষ্টেশনে পৌঁছাই। সেই ষ্টেশনের বাবু নূর আহমদ সাহেবকে কাজী সাহেব বলেন, আপনি লাহোরে সংবাদ পাঠিয়ে খবর নিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ আসলেই সঠিক কি না? আমাদের এই অবস্থা দেখে অনেক গয়ের আহমদী হাসি-ঠাট্টা করতে করতে আমাদের পিছনে আসছিল। যার যা ইচ্ছা তারা আজেবাজে কথা

বলছিল। আমরা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে উম্মাদপ্রায় নিজেদের বাড়ীতে ফেরত আসি। আর গয়ের আহমদীরা হাসি-ঠাট্টা করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের পিছনে আসে। অবশেষে বাজে কথা বলতে বলতে ফেরত চলে যায়। এ ঘটনা আহমদী জামাতের জন্য খুবই পীড়াদায়ক ও প্রাণান্তকর ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত হযরত মওলানা হেকীম নূরউদ্দীন (রা.) প্রথম খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন। আমরা সবাই নিজ নিজ বয়আত নবায়নের পত্র পাঠিয়ে দেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবর্তমানে যখন আমরা প্রথম জলসা সালানায় যাই, যে যে স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বসতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম সেই স্থানগুলো শূন্য দেখে হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে যেত। সর্বদা চোখ অশ্রুসিক্ত থাকত। এ জলসা আহমদীয়া মাদ্রাসার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের জলসা সমূহের তুলনায় খুবই সাদামাটা ছিল। সেই জলসায় খাঁজা কামাল উদ্দীন সাহেব, মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব, মৌলবী সদরুদ্দীন সাহেব, মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব প্রমূখদের সর্বাগ্রে দেখা যেত। সবার দৃষ্টি তাদের প্রতিই নিবদ্ধ হত। অর্থাৎ জামাতের সবার দৃষ্টি তাদের প্রতিই ছিল। বাস্তবে তখন এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কাউকে যোগ্য হিসাবে মনেই হত না এবং তারাই ব্যবস্থাপক ছিলেন। জলসার প্রারম্ভে কুরআন তিলাওয়াত হয়। অতঃপর ভাই মুন্শী সিরাজ উদ্দীন সাহেব মহানবী (সা.)-এর মহিমা বর্ণনায় একটি নযম পড়েন, তারপর আরেকজন অন্য একটি নযম পড়লেন। এরপর হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব বক্তৃতা করেন, {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সময়কার প্রথম জলসার কথা।} তিনি বলেন, ফিরাউনের যুলুম ও নির্যাতনের কারণে বণী ইসরাঈলের যে অশ্রু ঝরেছিল একদিন সেই অশ্রুই সমুদ্র হয়ে ফেরাউনকে ডুবিয়েছে। (এই অবস্থায় বা নিরূপায় অবস্থায় বা কষ্টের সময় যে অশ্রু প্রবাহিত হয় তা বড় উত্তম ফল নিয়ে আসে। জামাতকে, বিশেষ করে পাকিস্তানের জামাতগুলোকে এটি স্মরণ রাখা উচিত, আজকাল এমন অশ্রু বিসর্জনের সময়) বলা হয়ে থাকে, বণী ইসরাঈলের যে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল একদিন সেই অশ্রুই সমুদ্র হয়ে ফেরাউনকে নিমজ্জিত করেছিল। তিনি (রা.) এই বক্তৃতা এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে, শ্রোতামন্ডলীর অবস্থা মন্ত্রমুগ্ধের মত ছিল, যখন তাঁর এই বক্তৃতা শেষ হয়েছিল তখন হযরত আমিরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) নিজের বক্তৃতা আরম্ভ করার পূর্বে বলেন, মিয়াঁ মাহমুদ আহমদ সাহেব আজ এমন বক্তৃতা দিয়েছে যে, আমার মাথায়ও কোন সময় এই বিষয়টি আসেনি। অতঃপর বলেন, বন্ধুদের উচিত দ্বিতীয় কুদরত বা খিলাফতের জন্য দোয়া করা, অর্থাৎ দ্বিতীয় কুদরত যেন চিরস্থায়ী হয়, সে উদ্দেশ্যে দোয়া করতে বলেছেন। তখনই দোয়া করা হয়েছিল আর তিনি তখন একথাও বলেছিলেন, মিয়াঁ সাহেবের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন।

হযরত শেখ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন। আমি যখন মসজিদে মুবারকে গিয়ে নামায পড়তাম, তখন নামাযে সেই স্বাদ এবং খোদা ভীতি হৃদয়ে সৃষ্টি হত যা অনির্বচনীয়। খোদার ভালবাসায় পাগল হয়ে যেত। কিন্তু আমার হে বন্ধুগণ! যখন সেই ঐশী জ্যোতিকে দেখা হতে চোখ বঞ্চিত থাকে তখন আমি ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আর সেই সাহচর্যের কথা স্মরণ করে হৃদয় ব্যথায় ভরে যায়। আল্লাহ্‌র কসম! সেই ঐশী জ্যোতি দেখে হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে যেত এবং হযরত আকদাসের পবিত্র ও জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে না কোন দুঃখ থাকত আর না-ই কারও অভিযোগ-অনুযোগ থাকত। এমন মনে হত, যেন এখন আমরা জান্নাতে আছি আর তিনি (আ.)-কে দেখে আমাদের চোখ ক্লান্তও হত না। এমন পবিত্র ও জ্যোতির্মন্ডিত চেহারা ছিল যে, পাঁচ বেলার নামাযের ক্ষেত্রে আমাদের যুবকদের রীতি ছিল, আমরা তাঁর বা'দিকে জায়গা পাবার মানসে এক নামাযের পর

পরবর্তী নামাযের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিতাম। হযরত আকদাস (আ.)-এর পাশে জায়গা পাবার এবং তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার জন্য আমাদের যুবকদের মাঝে প্রতিযোগিতা লেগে থাকতো। এরপর তিনি লিখেন, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি! তিনি যে অসাধারণ কল্যাণময় ও পবিত্র সত্তা ছিলেন যার পরশ আমাদেরকে পরবিমূখ করে দিয়েছেন, এবং এমন ধৈর্য দিয়েছেন যা খোদা ছাড়া অন্য সকল মোহ থেকে আমাদের মুক্ত করে দিয়েছে। আর আমাদেরকে খোদা তা'লার আস্তানা দেখিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও তাঁর হাতে বয়আতের দাবী অনুসারে কাজ করার তৌফিক দান করুন আর তাঁর (আ.) সাথে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার বন্ধনকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার তৌফিক দান করুন। আর এই সম্পর্কের কল্যাণে মহানবী (সা.)-এর পরিপুর্ণ অনুসরণ করে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করতে পারি।

এখন আমি জুমুআর নামাযের পর দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াবো। দু'টিই কাদিয়ানের দু'জন পুণ্যবতী মহিলার জানাযা। প্রথম জানাযা হল, শ্রদ্ধেয়া রাশীদা বেগম সাহেবার যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম মিস্ত্রী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবের স্ত্রী। তিনি গত ৪ মে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ ফতেহ দ্বীন সাহেব (রা.)-এর কন্যা ছিলেন। তিনি হযরত আম্মা আয়েশার ভাগ্নী ছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশে যিনি খুবই পরিচিত ছিল একটি নাম। (হযরত আম্মাজান তাঁকে মেয়ে বানিয়েছিলেন অর্থাৎ হযরত আম্মা আয়েশাকে)। কাদিয়ানে হযরত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম সাহেবের স্ত্রীর সাথে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বামীর সঙ্গে তিনিও অত্যন্ত কষ্টের মাঝে দরবেশী জীবন কাটিয়েছেন কিন্তু স্বানন্দে ও প্রফুল্লচিত্তে। মরহুমা ১৯৪৪ সালে ওসীয়্যত করার সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি ছয় বছর যাবত লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা প্রদানেরও সুযোগ লাভ করেছেন। মরহুমার ৪জন পুত্র ছিলেন, যাদের মাঝে বড় ছেলে হামীদ উদ্দীন শামস সাহেব জামাতের মুবাল্লেগ ছিলেন, যিনি ৪৭ বছর বয়সে মরহুমার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ওহীদ উদ্দীন সাহেবও ওয়াকেফে যিন্দেগী। অপর পুত্র রশীদ উদ্দীন সাহেবও সদর উমুমী হিসেবে কাজ করছেন। একইভাবে তাঁর আরেক পুত্র নাসীর উদ্দীন সাহেবও সেখানে কাজ করছেন। মরহুমার জামাতাদের মধ্যে সৈয়দ আব্দুন্ নাকী সাহেব ভাগলপুরের আঞ্চলিক আমীর। আব্দুর রফী সাহেব উমুরে আম্মায় কাজ করেন। মরহুমা পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা, তাহাজ্জুদ এবং প্রত্যহ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন। কাদিয়ানে তিনি রাশিদা খালা নামে পরিচিত ছিলেন। এই বোন মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের স্ত্রীর সাথে সব জায়গায় থাকতেন আর সকল সুখে-দুঃখে লোকদের ঘরে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য যেতেন।

মিয়াঁ ওয়াসীম আহমদ সাহেবের ছোট কন্যা আমাকে লিখেছেন, মরহুমা অত্যন্ত অনাড়ম্বরতার মাঝে পুরো জীবন অতিবাহিত করেছেন। আঞ্জুমানের চাকরী থেকে মরহুমার স্বামী যখন অবসর গ্রহণ করেন, সে সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদির সমন্বয়ে বেশ বড় অংক পেয়েছিলেন। তখন তিনি চিন্তা করলেন, আমি কখনো আমার স্ত্রীকে কোন অলঙ্কারাদী বানিয়ে দেইনি। একথা ভেবে তিনি তাঁকে কয়েকটি সোনার চুড়ি বা কানের দুল বানিয়ে দিয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নতুন কেন্দ্রের জন্য আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করেন। মরহুমা তাঁর অলংকারাদি এনে সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের স্ত্রীকে দেন এবং বলেন, আমি সারা জীবন কোন স্বর্ণালঙ্কার পরিনি এখন আর পরে কী হবে তাই এসব রেখে দিন।

এসব চাঁদা ও অলঙ্কারাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনার দায়ীত্ব ছিল মরহুমার স্বামীর উপর। তিনি যখন দেখলেন এই কানের দুল তাঁর স্ত্রীর পক্ষ থেকে এসেছে তখন ব্যবস্থাপকদের বলে, এর সঠিক মূল্য পরিশোধ করেন। কিছু অর্থ তাঁর কাছে ছিল, তিনি তদ্বারা মূল্য পরিশোধ করে পুনরায় তাঁর স্ত্রীকে অলংকার ফিরিয়ে দেন। কয়েক সপ্তাহ পর দ্বিতীয়বার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাহরীক করেন। তিনি আবার সেই স্বর্ণের দুল দিয়ে দেন। সে সময় তাঁর স্বামীর কাছেও কোন টাকা-পয়সা ছিল না। মূলতঃ তিনি একথাই বলেছিলেন, সারা জীবনে আমি স্বর্ণের কোন কিছু পরিনি, তাই এখনও পরবো না। এ ভেবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন।

দ্বিতীয় জানাযাটি হচ্ছে ভারতের জনাব সাঈফ খাঁন সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া নযরুন্নেসা সাহেবার। তিনি গত ৯ মে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাঁর স্বামী ১৯৬২ সালে আহমদীয়াত গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন আর বিরোধিতা সত্ত্বেও উভয়ই আহমদীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নামাযের প্রতি একনিষ্ঠ, মিশুক, দরিদ্রদের আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করেছেন। ডজনাধীক এতিম ও অনাথ শিশুদের দেখাশুনা ও লালন-পালন করেছেন। মরহুমা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের আন্তরিক সেবাযত্ন ও আপ্যায়ন করতেন। তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন, তাঁকে বেহেশতি মাকবেরা কাদিয়ানে দাফন করা হয়েছে। তাঁরও তিন ছেলে জামাতের সেবক এবং ওয়াকেফে যিন্দেগী। বড় ছেলে নাসীম খাঁন সাহেব, কাদিয়ানের নাযের উমুরে আমা, দ্বিতীয় ছেলে কলীম খাঁন সাহেব মুবাল্লেগ, একইভাবে ওয়াসীম খাঁন সাহেব সহ তারা সবাই ওয়াকেফে যিন্দেগী। আল্লাহ্ তা'লা এ উভয় মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আর তাঁদের বংশধরদেরকেও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন এবং তাদের মাঝে সর্বদা বিশ্বস্ততা এবং একনিষ্ঠতার সম্পর্ক বজায় থাকুক।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)